ঈশ্বর-নারী-ভালোবাসা : বার্গম্যানের আত্মপরিক্রমা

সোমেন ঘোষ

বিশ্ব চলচ্চিত্রের আকাশে যে'কটি নক্ষত্র দীপ্যমান, ইঙ্গমার বার্গম্যান ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম। এমন বললে ভুল হবে না যে, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের তিনিই শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার। ২০০৭-এর আগস্ট মাসে ৮৯ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হলেন। জন্মসূত্রে ছিলেন সুইডেনের মানুষ। তাঁর সৃজনকর্মের মহিমাতেই সুইডিস চলচ্চিত্রের প্রতি গত অর্ধ শতাব্দীর বেশি চলচ্চিত্র রসিকদের নতুন ক'রে নজর পড়ে। তাঁরই কৃতীতে সুইডিস চলচ্চিত্র আজ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্বতন্ত্র মর্যাদায় চিহ্নিত। তাঁকে চেনার আগে যে'কজন সুইডিস চলচ্চিত্র পরিচালকের কাজের সঙ্গে আমাদের অল্প পরিচয় ছিল, তাঁরা অনেকেই ছিলেন নির্বাক যুগের প্রতিভূ। যেমন ভিক্টর সোস্ত্রোম, মরিজ স্টিলার, আলফ্ সোবার্গ, গুস্তাফ মোলানডার, এ্যান্ডার্স হেনরিকসন প্রমুখ। এঁদের অনেকেরই কাছে বার্গম্যানের কিছু ঋণ স্বীকার্য ছিল। সুইডিস ঔপন্যাসিক শ্রীমতী ল্যাগেরলফ্, পরিচালক সোস্ত্রোম ও মরিজ স্টিলারের আঙ্গিক থেকে বার্গম্যান আক্ষরিক অর্থে লোক-ঐতিহ্যের রস আহরণ করেছিলেন এবং তাকে চলচ্চিত্রের পর্দায় সঞ্চারিত করেন। কিন্তু এটাই সব নয়, লোকরীতির পাশাপাশি বার্গম্যান পরিশীলিত নাট্য ঐতিহ্যের জটিলতা ও অপেক্ষাকৃত মার্জিত রূপের স্বীকরণ ঘটিয়েছিলেন, যে ঐতিহ্য ফ্রান্স বা ব্রিটেনের রীতি থেকে খুব একটা বিচ্ছিন্ন ছিল না।

বার্গম্যানের শিল্পকর্মের অন্দরমহলের স্বরূপ জানতে হলে সুইডেনের স্থানিক অবস্থানটা বুঝে নেওয়া দরকার। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো এবং ঐতিহাসিকভাবে ও মানসিকভাবে বিংশ শতাব্দীর দুটি মহাযুদ্ধে পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকার পরিকল্পনায় সুইডেন ষাট দশকেও অনেকভাবে বহু দূরে সরে থাকা একটি দেশ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। যেন অনেকটা নিজের অতীতের মধ্যেই বন্দী থেকে দেশীয় ঐতিহ্যের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকা। পশ্চিমী দুনিয়ার সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে সরে থাকা সুইডেনের এই বিচ্ছিন্নতা বার্গম্যানের প্রথম দিকের ছবির পরিমণ্ডল হিসেবে লক্ষণীয়।

বার্গম্যানের সৃষ্ট চলচ্চিত্রপঞ্জীতে এক নজর দৃষ্টি দিলে তাঁর সৃজনশীলতার প্রগতির রেখাটিকে সহজে চিনে নেওয়া যাবে। জন্মেছিলেন সুইডেনের এক শহর আপ্‌সালায়। ১৭ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। স্টকহোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুরু হয় কিন্তু স্নাতক ডিগ্রি সমাপ্ত হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই অপেশাদার নাটক মঞ্চস্থ করেন। পরে অনেক স্থানীয় থিয়েটারে নাটক পরিচালনা করেন এবং অভিনয়ও করেন, যার মধ্যে সমসাময়িক নাটকের পাশাপাশি শেক্সপীয়র ও স্ট্রীন্ডবার্গের নাটকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির সময়ে বার্গম্যান নিজেকে ব্যস্ত রাখেন একাধিক উপন্যাস, নাটক রচনায়। এই সময়েই চিত্রনাট্য লেখেন যেটি পরে আলফ্ সোবার্গের পরিচালনায় চলচ্চিত্রায়িত হয় 'টরমেন্ট' (১৯৪৪) নামে। পরের বছরেই ১৯৪৫-এ বার্গম্যান নিজের চিত্রনাট্য নিয়ে তাঁর প্রথম ছবি 'ক্রাইসিস' নির্মাণ করেন। এ ছবিতে তিনি আমাদের প্রাপ্তমনস্ক সমাজের পীড়নের দ্বারা আক্রান্ত বয়ঃসন্ধির সমস্যাকে স্পর্শ করেন। পরবর্তী বেশ কয়েকটি ছবিতে এই বিষয়ই ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়। এরই মধ্যে তিনি কামুর 'ক্যালিগুলা', টেনেসী উইলিয়ামের 'এ স্ট্রীটকার নেমড্ ডিজায়ার' এবং নিজের একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেন। এসব সৃষ্টিতে সার্ত্র এবং পিরান্দেল্লোর প্রভাব অলক্ষিত থাকে না। নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবহারিক দক্ষতা ও কল্পনাশক্তি তাঁকে ক্রমশ নাট্যাঙ্গিকে পরিশীলিত করে তোলে। আর এখানেই তিনি প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গের সংস্পর্শে আসেন যা পরবর্তী সময়ে তৈরী ছবিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর ভেতর দিয়েই বার্গম্যান শিল্পীদের জীবন ও সংকটকে অন্য চেহারায় দেখার উৎসাহ বোধ করেন। বার্গম্যানের ছবিতে কুশীলবদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো। কেবল থীমের গভীরতাতেই নয়, যাঁরা তাঁর ছবিতে চরিত্রের রূপদান করেছেন, বার্গম্যান তাঁদের শিল্পীসত্তাটিকে পুরোপুরি নিঙড়ে নিতে পেরেছেন। ফলে তাঁর ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এক ভিন্ন উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান হয়ে ওঠেন। কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে এক অসাধারণ সখ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসলে তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর ছবির শিল্পীদের মধ্যে এক বিরল অভিনয় ক্ষমতা উদ্রেক করে দেন, ফলে ছবির পাত্র পাত্রীরা আর কাহিনীর চরিত্র থাকে না, আমাদের অনুভবের একান্ত শরিক হয়ে ফুটে ওঠেন। যাঁরা তাঁর ছবিতে প্রায়শই রূপদান করেছেন, যেমন ম্যাক্স ভন সিডো, গুণার বর্ণস্ট্র্যান্ড, ইনগ্রিড থুলিন, বিবি এ্যান্ডারসন, লিভ উলম্যান, এঁরা কেবল চরিত্র রূপদানকারী শিল্পীই নন, পরন্তু বার্গম্যানের গোটা শিল্পীসত্তার দর্পণ হয়ে ওঠেন।

প্রথমদিকের মেলোড্রামাধর্মী ছবিতে তিনি মূলত পুরুষ-নারীর তিক্ত সম্পর্কের ছবি আঁকেন। ১৯৫১ ও ১৯৫৩ তে তৈরী তাঁর ছবি যথাক্রমে 'সামার ইন্টারলুড' ও 'সামার

উইথ মণিকা'-তেই বার্গম্যান নিজের শিল্পীসত্তায় প্রথম ভাস্বর হয়ে ওঠেন। এ দুটি ছবিতে বয়ঃসন্ধির প্রেম ও তজ্জনিত মোহভঙ্গের বেদনা চিত্রিত হয়। 'দ্য নেকেড নাইট' (১৯৫৩) ছবিতে ভ্রাম্যমাণ সার্কাসদলের মানুষদের ব্যক্তিজীবনের প্রেম, ব্যর্থতা ও মানবিক যন্ত্রণার কাহিনী বিবৃত হয় তাঁর স্বকীয় স্টাইলে। মানুষের অন্তিম দুর্ভোগ ও অসহনীয় একাকিত্ব এ ছবির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে। এই বিষয়ই তাঁর পরের অনেক ছবিতে ঘুরেফিরে আসে নানা রীতিতে, নানা প্রতীকে। কিন্তু কেবল বিষাদই নয়, সূক্ষ্ম কৌতুক রসবোধের ছবিতেও তিনি দক্ষ তার প্রমাণ তাঁর 'এ লেসেন ইন লাভ' এবং 'স্মাইলস্ অফ এ সামার নাইট' (১৯৫৫)। তাঁর পরবর্তী কমেডি ছবি 'দ্য ডেভিলস আই' (১৯৬০) ও 'নাউ এ্যাবাউট অল দিস উওমেন' (১৯৬৪)-এও তাঁর কৌতুক রসবোধের গভীর পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

এইসব ছবিতে নিজেকে দক্ষ চিত্রপরিচালক রূপে প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও, বিশ্ব চলচ্চিত্রে বার্গম্যান যে অভিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও সম্মানিত সেখানে দুটি বিষয় তাঁর শিল্পকর্মের মূল আধার হিসেবে আমাদের পরম শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। নর নারীর প্রেম যৌনতা, পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও ধর্মকেন্দ্রিক গভীর আত্মজিজ্ঞাসা তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের ছবির মূল সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। ধর্ম বলতে তিনি বিশেষ কোনো বিশ্বাসের পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা ও নৈতিক উত্তরণই তাঁর মূল অন্বেষণ ছিল। তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ' (১৯৫৭) করার সময় তিনি বলেছিলেন—"To me religious problems are continually alive ... not on the emotional level, but on an intellectual one"। তাই আমরা তাঁর 'দ্য সেভেন্থ সীল'-এর নায়ক বীর যোদ্ধাকে তার গৃহ প্রত্যাবর্তনের অনুগমনকারী মৃত্যুকে বলতে শুনি "I want knowledge, not faith"। তাঁর 'ভার্জিন স্প্রিং', 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি', 'উইন্টার লাইট', 'সাইলেন্স' ইত্যাদি ছবিতে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রতি বার্গম্যানের প্রত্যাখ্যান তাঁর মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে উন্মোচিত করে। মানব মানবীর সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও বিচ্ছিন্নতা, প্রেম-প্রেমহীনতা, গভীর একাকিত্ব থেকে বার্গম্যানের মধ্যে মানুষের সার্বিক আত্মসংকটের ভয়ংকর রূপটা তাঁকে পীড়িত করে। উত্তরণের পন্থা হিসেবে তিনি মৃত্যুকে জানতে চান, মৃত্যু কি মানুষের অস্তিত্বের শেষ কথা? মৃত্যুত্তীর্ণ কোনো পরিসরে মহিমান্বিত পরমপুরুষ কেউ আছেন কি? তিনিই কি পার্থিব ধারণায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর? এ সব প্রশ্ন নিয়ত তাঁকে বিচলিত করেছে। বার্গম্যান এসবের উত্তর খুঁজেছেন তাঁর ছবির ঘটনা ও পাত্র পাত্রীদের কার্যকারণের বিন্যাসে।

আমরা জানি, বার্গম্যান পঞ্চাশ দশকেই স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সে

সময়েই তাঁর ছবি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয় এবং বিশ্ব চলচ্চিত্রের শিল্পরসিকেরা বার্গম্যানের সৃষ্টির প্রতি ক্রমশ কৌতূহলী হতে শুরু করেন। 'সেভেন্থ সীল' (১৯৫৭), 'সডাস্ট এ্যান্ড টিনসেল' (১৯৫৩), 'স্মাইলস্ অফ এ সামার নাইট' (১৯৫৫) 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ' (১৯৫৭), 'দ্য ম্যাজিসিয়ান' (১৯৫৮) ইত্যাদি ছবির আন্তর্জাতিক সম্মান ও বিতর্কিত সমালোচনায় তিনি ততোদিনে বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম আলোচিত স্রষ্টা। কিন্তু তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের চলচ্চিত্র 'ত্রয়ী' — 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি' (১৯৬১), 'উইন্টার লাইট' (১৯৬৩) এবং 'সাইলেন্স' (১৯৬৩) তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির অন্যতম চলচ্চিত্র স্রষ্টা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এসব ছবিতে বার্গম্যানের ভূমিকা চলচ্চিত্র শিল্পী রূপে নয়, তিনি অবতীর্ণ দার্শনিক রূপে। মানুষের জীবন ও চৈতন্যের নিভৃতে যে গভীর আঁধার, যে তীব্র সত্তাসংকটে মানুষ নিয়ত নিঃসঙ্গতা পীড়িত ও অসহায়, বার্গম্যান সেই ছায়াচ্ছন্ন প্রদেশে আলো ফেলেন নিজের চেতনার অনুভবে। 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি'-র কিশোর চরিত্রদ্বয় নিষ্পাপ অজ্ঞানতায় দৈহিক পাপে জড়িয়ে পড়ে। পুত্রকন্যার প্রতি এতাবৎ উদাসীন পিতা ডেভিড নিজের কাজের জগতেই মগ্ন, স্বার্থপর। ছেলেমেয়েদের পতন তাকে পীড়িত করে, আত্ম অনুশোচনায় সে দগ্ধ হয়। ছবির শেষে পিতার শরণাপন্ন হয় মিনুস। বাবা তাকে সান্ত্বনা দেয়, সে উল্লসিত হয় — 'বাবা এতদিনে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।' তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে একটা হেলিকপ্টার। যেন এক ঈশ্বরের প্রতীক। 'উইন্টার লাইট'-এ গীর্জার যাজক নিরুত্তাপ টমাস আর তার প্রেমিকা মার্তার সম্পর্কের শিথিলতা আমাদের অস্বস্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। তার প্রাত্যহিক শুকনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মতোই মার্তা ও তার সম্পর্ক জীর্ণ ও ভঙ্গুর। বোমাতঙ্কে মারা যায় জোনাস। টমাসের মনে জীবনের অপর পারের এক রহস্যাবৃত হাতের ছায়া বিস্তার লাভ করে। বীতস্পৃহ মার্তাও তাকে ধিক্কার জানায় — "your faith seemed obscure and neurotic and I cannot understand your indifference to Jesus Christ"। জীবন ও ধর্মীয় অনুশাসন ব্যথায় অভ্যস্ত যাজক এখন নিজের কর্ম ও বিশ্বাসের মুখোমুখি দাঁড়ায়। এতদিনে তার চৈতন্য জাগ্রত হয়। তার কণ্ঠে আমরা শুনি অনুতাপের বাণী — 'Oh God, why hast thou forsaken me."। বোমাতঙ্কে পীড়িত জোনাসকে টমাস খৃষ্টীয় মন্ত্রোচ্চারণে শান্ত করতে পারেনি। জোনাসের পাল্টা প্রশ্নে টমাস বিব্রত বোধ করেছে — "আমাদের তবে কী হবে?" শেষে জোনাস আত্মহত্যা করে। খৃষ্টীয় সান্ত্বনা তাকে পরিত্রাণ দেয়নি। ছবির অন্তিমে টমাসের আন্তর উপলব্ধিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নীরস মন্ত্রোচ্চারণ নয় — মহিমাময় পরমপিতার আলোকবর্তিকা জেগে ওঠে।

"For knowledge is of things we see;
And yet we trust it comes from thee,
A beam in darkness, let it grow" : এ—
"নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো/যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো"।

'সাইলেন্স' ছবিতে বার্গম্যান মানুষের একাকীত্বের চূড়ান্ত স্তরকে স্পর্শ করেন গভীর মমত্বে। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত বড়বোন এস্টার আর ছোট বোন আন্না যেন আত্মা ও দেহের দুটি প্রতীক। দু'জনেই আত্মিক পীড়নে অসহায়। আন্না দেহজ কামনায় তাড়িত। আর বড়বোন এস্টার অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী। ছোট বোন তাকে হোটেলে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে নিজের কিশোর পুত্রকে নিয়ে অজানার পথে পাড়ি দেয়। হোটেল ঘরের শয্যায় দুঃসহ একাকিত্ব আর চরম অসহায়তায় এস্টার ঈশ্বরের নির্বাক, হিমশীতল নিঃস্তব্ধতার মুখোমুখি হয়। অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে, নিষ্ঠুর আঘাতে মানুষ ক্ষতবিক্ষত। এই কি তবে মানুষের অন্তিম বিনাশ? এর থেকে কোনো পরিত্রাণ কি আদৌ নেই? যদি থাকে, তবে তা কোথায়? 'পার্সোনা' (১৯৬৬) ছবিতে বার্গম্যান নতুনভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক উপভোগের আকাঙ্ক্ষকে দুদিক থেকে একীভবন ঘটালেন। কেউ কেউ এ ছবিকে তাঁর পূর্বতন 'দ্য ফেস' ছবির নতুন সংস্করণ হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। বার্গম্যান মূলত অন্তর্জগতের রূপকার। যতদিন গেছে, তাঁর শিল্পের প্রগতিতে চোখ রাখলে আমরা অনুভব করবো তিনি ক্রমশ মানুষের ব্যক্তিজীবনের উপরিস্তরে নয়, বরং অন্তর্লোকের গভীরে গোপনে ডুবুরির মতো তল্লাসি চালিয়ে নানা অনুষঙ্গ আহরণ করে আনছেন। তাই তাঁর শেষ দিকের প্রতিটি শিল্পকর্মে তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট মানুষের আত্মাকে আলেকিত ক'রে তোলা। 'পার্সোনা' তাঁর অন্যতম বিতর্কিত ছবি। এখানে তিনি ক্রেয়টিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং পরাবাস্তবকে একত্রে মিশিয়ে এক যুগ্ম শিল্পরূপের জন্ম দিয়েছেন। স্বামীর প্রেম ও সন্তানের ভালোবাসা থেকে পরিত্যক্ত এ ছবির নায়িকার স্বকৃত নীরবতা তার চারপাশে এক আত্ম-অবরোধ গড়ে তোলে, অথচ তার পারিপার্শ্বিক জগতের ভয়ংকরতা তাকে আত্মবিনাশের দিকে নিয়ে যায়। এই থীমই পরের দিকে 'দ্য শেম' (১৯৬৮) ছবিতে আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। এ ছবির আত্মকেন্দ্রিক সঙ্গীতশিল্পী তার দেশের যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে, অথচ এক চূড়ান্ত অবিবেচক ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক কাজে সে শরীরে মনে বিপর্যস্ত হয় কেবল আতংকের কারণে। 'দ্য শেম', 'আওয়ার অফ উল্‌ফ' (১৯৬৮), 'প্যাশন অফ এ্যানা' (১৯৬৯), 'ক্রাইজ এ্যান্ড হুইসপার্স' (১৯৭৩) ছবি কটিতে বার্গম্যান আধুনিক সমাজে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার সংকটকে আরো মর্মন্তুদ করে তোলেন। 'প্যাশন অফ এ্যানা' সম্পর্কে বার্গম্যান নিজে বলেছিলেন — "It was

untill A Passion that I really got to grip with man-woman relationship"। এ ছবিতে তিনি মানুষের অন্ধকারাবৃত যৌনাকাঙ্ক্ষর স্বরূপটাকে ব্যক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন। পরবর্তী ছবিগুলোতে বার্গম্যান মূলত গোটা নারী জাতির চরিত্রের অন্তরলোক ও বহির্জগতের চেহারাটাকে উন্মোচিত করায় মগ্ন ছিলেন।

এই পর্বের ছবিতে বার্গম্যান বেশিমাত্রায় মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচনে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। প্রেম, প্রীতি ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত নারীর নিগূঢ় যন্ত্রণা ও মানসিক প্রেষণ তাঁর এই পর্বের ছবিতে ফুটে ওঠে আর এক মাত্রায়। স্নেহ-মমতা-প্রেমহীন পারিবারিক সম্পর্কের রিক্ত, ভয়ংকর, শূন্যতাবোধের হাহাকারে বিধৃত 'ক্রাইজ এ্যান্ড হুইসপার্স' তাঁর প্রথম রঙীন ছবি। ছবির সব চরিত্ররাই অন্দরমহলের বাসিন্দা। এ ছবিতে ক্যামেরা খুব একটা বহির্দৃশ্যের কাজে ব্যবহৃত হয়নি। ছবির মূল চারটি নারী চরিত্র — রোগাক্রান্তা এ্যাগনেস, তার শুশ্রূষাকারিণী আন্না, জ্যেষ্ঠা ভগিনী কারিন দৈহিক কামনা পরাঙ্মুখ, কনিষ্ঠা মারিয়া কামনাতাড়িত। একমাত্র পরিচারিকা আন্না ভালোবাসা, মমতা আর বিশ্বস্ততার প্রতীক। এক বিপুল নিষ্ঠুরতায় বার্গম্যান নারীর রহস্যময় মানসগভীরে ডুব দেন। পারিবারিক সম্পর্কের এই অন্তঃসারশূন্যতায় আমরা বিমূঢ় হই।

নর নারীর সম্পর্কের রহস্যাবৃত দিকটি চিরকালই বার্গম্যানকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 'দ্য টাচ' (১৯৭১) ছবিতে তিনি আবেগতাড়িত রমণীর বিবাহ-অতিরিক্ত অবৈধ প্রণয়ের দ্বন্দ্বকে চিত্রায়িত করেন। তাঁর 'ফেস টু ফেস' (১৯৭৬) ছবিতে তিনি নিরুত্তাপ এর নারীর স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত অলীক বিশ্বাসের দুর্ভোগ তুলে ধরেন। 'সীন্‌স্ ফ্রম এ ম্যারেজ' (১৯৭৪) ছবিতে উঠে আসে এক পেশাদার দম্পতির দীর্ঘ প্রলম্বিত প্রেমজীবনের ভঙ্গুরতা। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পরেও স্বামী স্ত্রী একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এক অদ্ভুত দ্বিধা, সংশয় আর আত্মযন্ত্রণায় তারা কাতর হয়। শেষ পর্বে বার্গম্যান তৈরী করেন এক অনবদ্য অপেরা ফিল্ম 'ম্যাজিক ফ্লুট' (১৯৭৫)। সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানের দার্শনিক রহস্যময়তায় নিবিড় মোৎসার্টের এই অপেরার মূল মুদ্রিত সংস্করণটি বার্গম্যানের শিল্পমানসিকতায় যে দার্শনিক প্রজ্ঞার উন্মেষ ঘটিয়েছিল, পরিচালক তাকে স্বকীয় মননের আলোকে চিত্রিত করেছেন। যুগপৎ নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রতি সমান অঙ্গীকারবদ্ধ বার্গম্যান ক্যামেরার দৃষ্টিকোণে মূল অপেরার নাট্যলক্ষণ ও সাংগীতিক ভাষ্যটিকে নিজের ভাবনা চিন্তা অনুযায়ী ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'সার্পেন্টস্ এগ' (১৯৭৭) ছবিতে বার্গম্যান নাৎসীবাদের বর্বরতাজনিত ধর্ষকামের প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর 'অটাম সোনাটা' (১৯৭৮) ছবিটি এক মায়ের কাহিনী বিবৃত করছে, যে মা ভালোবাসতে পারে না। ১৯৭৪-এ তৈরী 'সীন্‌স্ ফ্রম এ ম্যারেজ' ছবিতে তিনি নতুন সিনেম্যাটিক প্রকরণ যুক্ত করেন। ছবির কাহিনীর শরীরে তিনি ডকুমেন্টারী

টেলিভিশন পদ্ধতিকে মিশিয়ে দেন। কিন্তু এখানেও মানবীয় সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। আয়করের ঝামেলার জন্য তিনি স্বেচ্ছানির্বাসন নেন এবং সুইডেন ছেড়ে মিউনিখে অবস্থান করেন। সেখানেই নিজস্ব প্রযোজনা কোম্পানি খোলেন এবং নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেন। ১৯৭৮-এ বার্গম্যান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অতিরিক্ত আয়কর প্রদান ক'রে একটা সমঝোতায় আসেন। তৈরী করেন তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের শেষ দুটি ছবি। তাঁর জার্মানীতে তৈরী এক ভাগ্যহত বৈবাহিক সম্পর্কের মনুষ্যদ্বেষী বিশ্লেষণের চিত্রকর্ম 'ফ্রম দা লাইফ অফ ম্যারিওনেৎস' এবং মূলত দূরদর্শনের জন্য তৈরী আধা আত্মজীবনীমূলক ছবি 'ফ্যানি এ্যান্ড আলেকজান্দার' (১৯৮২) । এ ছবিতেই বার্গম্যান তাঁর চলচ্চিত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান।

বার্গম্যান যে দুটি বিষয়ে সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং সমালোচিত, তার একটি হ'ল তাঁর ঈশ্বর ভাবনা অন্যটি হ'ল নর নারীর প্রেম তথা তীব্র যৌনতা। বার্গম্যানের ছবিতে যৌনতার চরম প্রকাশ তাঁকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে। তিনি মানব-মানবীর যৌন মনস্তত্ত্বের দ্বারা পীড়িত। তাঁর কাছে পুরুষ-নারী তথা দুটি নারীর ঘনিষ্ঠ শরীরী আশ্লেষে যে গূঢ় মনোবিকলন কাজ করে তাকেই তিনি ছবির কাহিনী বা ঘটনা সংস্থানে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তি বিশেষকে ছাড়িয়ে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক দ্বন্দ্ব হিসেবে তিনি যৌনতাকে দেখাতে চান না। তাঁর ছবির পাত্র পাত্রীদের যৌনাচার, অভিব্যক্তি, সম্পর্ক, সম্পর্কহীনতা, ব্যক্তিজীবন ও আত্মিক স্তরের যন্ত্রণা শূন্যতাবোধের দ্বারা আক্রান্ত। পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে মানব-মানবীরা কীভাবে নিজেরা পীড়িত হয়, অন্যকে আত্মিক দহনে ক্ষতবিক্ষত করে, অভিযুক্ত করে — এইসব অনুভূতি আর যন্ত্রণাকাতর পরিস্থিতিগুলোকে তিনি ছবির দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পরখ করতে চান। এখানে যৌনতার পাশাপাশি মানবিক উত্তরণের ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রশ্ন তাঁর মনে জেগে থাকে, তা হ'ল ঈশ্বর ও ঈশ্বরহীনতার দ্বন্দ্ব। বার্গম্যান যে রীতিতে তাঁর ছবিতে ঘটনা বিন্যাস করেন, যে পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর চরিত্রদের উপনীত করেন, একজনের অস্মিতা আর একজনের ব্যক্তিত্বকে কীভাবে আচ্ছন্ন করে — এ সবকিছুর জন্ম মানুষের মনোবিকলনের গভীরে নিহিত থাকে, সেখানে এক ইন্দ্রিয়াতীত প্রবলতায় মানুষ অপর একটি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে। তাঁর ছবির পাত্র পাত্রী কেবল এইটুকু নিশ্চয়তা পেতে চায় এই ভেবে যে, তারা অন্তত এই মৃতপ্রায় পৃথিবীতে আবেগময়তাপূর্ণ সম্পর্কে বেঁচে আছে।

মানুষের যন্ত্রণা — মানসিক ও শারীরিক উভয়ত তাঁর ছবিতে যৌনতাকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয়েছে। যে যন্ত্রণা সবচেয়ে অনুভবযোগ্য এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষত সৃষ্টি হয় আর মানুষ তার অস্তিত্ব সংকটের তীব্রতাকে উপলব্ধি করতে পারে।

বার্গম্যান তাঁর ছবিতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক অবচেতনের তলদেশে ডুব দেন আর সেখান থেকে তাঁর চিত্রবিন্যাসের উপাদান কুড়িয়ে আনেন, যেখানে মানুষের জৈব কামনা, প্রেম ও প্রেমহীনতার যন্ত্রণাগুলো নানাবর্ণে চিত্রিত হয়। তাঁর চিত্রবিন্যাসে স্থান পায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্বামী ও তার রক্ষিতার সম্পর্ক, স্ত্রী ও তার প্রেমিকের মনোবিকলন তথা বিবাহগত সম্পর্কের শর্ত ও পরিপ্রেক্ষিত। আর তারই পাশাপাশি আচম্বিৎ পরিস্থিতিজনিত তাড়নায় ভাইবোনের যৌন সম্পর্ক কিংবা দুই বোনের শরীরী আকাঙ্ক্ষও উঠে আসে তাঁর ছবিতে। মানুষের জৈব কামনার গভীরে প্রোথিত আছে যে ফ্রয়েডীয় 'অদস' তাকে বার্গম্যান তাঁর চরিত্রদের ক্রমপরিণতির ভেতর দিয়ে তল্লাশ করেছেন।

তাঁর প্রথম দিকের ছবি যেমন 'ফ্রেঞ্জী', 'প্রিজন' ও 'পোর্ট অফ কল', দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সডাস্ট এ্যান্ড টিনসেল', 'জার্নি ইন্টু অটাম' থেকে শুরু করে প্রেমের বৃত্তায়নে তৈরি 'এ লেসন ইন লাভ', 'স্মাইলস্ অফ এ সামারনাইট' ও 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ' এবং পরবর্তী পর্যায়ের 'সো ক্লোজ টু লাইফ', 'দ্য ভার্জিন স্প্রিং' এবং তারও পরের তৈরী তাঁর অনবদ্য ট্রিলজি 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি', 'উইন্টার লাইট' এবং 'সাইলেন্স' এবং জগৎ ও জীবনকে নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় চেনার চেষ্টায় তৈরী তাঁর বিখ্যাত 'পার্সোনা', 'আওয়ার অব দ্য উল্ফ্' ও 'শেম' ইত্যাদি ছবির ভেতর দিয়ে আত্মযন্ত্রণা, মানবিক প্রত্যয়, বিশ্বাস ও বিশ্বাসহীনতার পরিক্রমায় বার্গম্যান প্রতিনিয়ত আজকের হতাশ্বাস দুনিয়ায় নিজের অবস্থানটা অনুসন্ধান করেছেন।

যৌনতা প্রদর্শনের নিরিখে বার্গম্যানের সবচেয়ে বিতর্কিত ও তীব্র সমালোচিত ছবি, ট্রিলজির শেষ পর্ব 'সাইলেন্স'। অনেকে এ ছবিকে মানুষের অসুস্থ মনোবিকারের প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ছবিতে মাত্রাতিরিক্ত যৌন দৃশ্যের অবতারণা প্রকৃত অর্থে আমাদের আধুনিক বিশ্বের মানুষের জৈব কামনার নির্মম অসহায়তাকে করুণতম রূপকল্পে চিত্রিত করে তোলে, যা দেখে আমরা আমাদের অবস্থান নিয়ে শিহরিত হই। বড়বোন এস্টার ও ছোটবোন এ্যানা ও তার ছেলে জনকে নিয়ে এক দুর্জ্ঞেয় মানবিক সম্পর্কের জাল বুনেছেন বার্গম্যান এ ছবিতে। মানুষের চিরন্তন আত্মিক ও শারীরিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি বার্গম্যানে গভীর নিষ্ঠা ও মমত্বে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। ছবিতে এ্যানা যদি শরীরী আকাঙ্ক্ষর প্রতিভূ রূপে চিত্রিত হয়ে থাকে, তবে দিদি এস্টার আত্মিক উত্তরণের অন্বিষ্ট প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানেও বার্গম্যান মানবিক দ্বন্দ্বের আভাস দেন। এস্টার যদি পরিপূর্ণরূপে মানুষের আত্মিক প্রতিভূ হ'ত তবে তাকে আত্মরতিতে মগ্ন হ'তে দেখতাম না, কিংবা ছোট বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সে লিপ্ত হ'ত না। আর অন্যদিকে এ্যানাকে যদি পরিচালক নিছক যৌন কামনা তাড়িত চরিত্র হিসেবেই

দেখাতেন তবে তার মধ্যে অপরাধবোধ জাগত না। ছবিতে বিন্যস্ত একাধিক যৌন সঙ্গমের দৃশ্যে বার্গম্যান পৃথিবীর আদিমতম রিপুর প্রতি চরম কারুণ্য আর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলেন। কেউ যদি মনে করেন প্রতিপাদ্যে পরিচালকের বিরাগজনিত রূপকল্পই কেবল তৈরি হয়েছে তবে ভীষণ ভুল হ'য়ে যাবে। এ ছবিতে ধর্ষকাম, মর্ষকাম, সঙ্গমের অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে, তা সত্ত্বেও এ ছবির দৃশ্যবিন্যাসে মানুষের জৈব অসহায়তা আমাদের বিমূঢ় করে। সিনেমাহলের চেয়ারে উপবিষ্ট ছোট বোন এ্যানা প্রবল জৈবিক তাড়নায় অপরিচিত সঙ্গীর সঙ্গে ভয়ংকর যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়। বড় বোন এস্টার এই নিদারুণ দৃশ্য চাক্ষুষ করে। সেখানে কিছু খুদে বামন প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে তরতর করে লাফিয়ে উঠে যায়। এখানে বার্গম্যান "isn't expressing disgust but insisting on man's divided nature: on the continuing and unassimilated power of basic drives after centuries of civilisation... if it evokes horror in the spectator though civilised sense of love-making becomes a public display in squalid surroundings, it equally evokes a powerful erotic response." যে দৃশ্যে বড়বোন এস্টার তার ঘরে এসে জানলা দিয়ে নীচে তাকায়, সে দৃশ্যবিন্যাস পর্দার বুকে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। একটা পাঁজর বের করা বুড়ো ঘোড়া একটা মালভর্তি গাড়ী টেনে নিয়ে চলেছে। এস্টার দেখে এবং তার মধ্যে করুণা জাগে। এ যেন অনেকটা তার আত্মযন্ত্রণারই সামিল। ঘোড়া অনেকটা তার অসহায় অবস্থার প্রতিফলন, অনেকটা বিশ্বের যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থার সারাৎসার। সমালোচক রিচার্ড এ. ব্লেক মন্তব্য করেছিলেন, "His treatment of sexuality is frank, graphic, and at times even revolving, but his stature as a film maker is so overpowering that no one could seriously accuse him of pandering."

তাঁর ছবিতে যৌনতা বিষয়টি বিবর্তিত হয়েছে মূলত দুটি প্রসঙ্গ আশ্রয় ক'রে। বার্গম্যান মনে করেন মানুষের যৌন অভিব্যক্তি ও তাবৎ আচরণ প্রকাশ পায় ভালোবাসা ও পারস্পরিক যোগাযোগের তীব্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত প্রদর্শিত চরিত্রের বন্ধ্যাত্ব ও যৌন অক্ষমতা আসলে শিল্পীর প্রার্থিত জগৎ গড়ে তোলার অক্ষমতা, যাকে তিনি নিজের শৈল্পিক কল্পজগতের প্রতিচ্ছায়ায় রূপ দিতে চেয়েছেন। আধুনিক বিশ্বে সমাজ যে বাতাবরণ তৈরী করে তুলেছে তাতে প্রেম কিংবা শিল্প, প্রকৃত অর্থে কোনোটাই সম্ভব নয়, যা অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল মৃত্যুর পরিদৃশ্যমান ছায়া। বার্গম্যান এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু ক'রে তাঁর শিল্পের অন্বিষ্টে পৌঁছতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর নীরব, মানুষের যন্ত্রণাকাতর অন্বেষণে, শরীরী ও আত্মিক পীড়নের উত্তরণে, শুদ্ধতম মানবিক উত্তরণে আধ্যাত্মিক চেতনা কোনো সদর্থক দিক দেখায় না। মানুষ এই আবহমান

বস্তুবিশ্বের উত্থান-পতনে নিয়ন্ত্রণহীন নিঃসঙ্গ পথিক মাত্র।

"বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী
অনুমানে শুরু সমাধা অনিশ্চয়ে
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে
তথাচ পাবো না আমি আপনার দেখা কি?—"

বার্গম্যান সত্যি কি ঈশ্বরের দেখা পেতে চেয়েছিলেন, নাকি কোনো নির্মল আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতি উন্মুখ ছিলেন। এই প্রবল একাকিত্ব নিয়ে আজকের মানব-মানবীর সম্পর্ক গড়ে, সম্পর্ক ভাঙে, নিদারুণ আত্মিক দহনে, ক্ষোভে, বিক্ষোভে দগ্ধ হয়। এর থেকে পরিত্রাণ কোন পথে — দীর্ঘ প্রসারিত তাঁর শিল্পজীবনে বার্গম্যান অবিরত সেই অনুসন্ধান চালিয়েছেন। বিষয়ের তাগিদে বক্তব্যের অনিবার্যতায় তাই তাঁর কোনো চরিত্রের যৌন ব্যভিচার বিদ্রোহের নামান্তর হ'য়ে ওঠে। সিনেমার পর্দায় এই প্রচণ্ডতাকে প্রত্যক্ষ করার ও দর্শককে তার শরিক করে তোলার একান্ত বাসনা তাঁর নির্মাণ শৈলীর অন্যতম উপাদান। তাঁর নিজের কথায় "It is one of the Cinema's perfectly legitimate functions: to visualize violence."

তিরিশ দশকের পরবর্তী সময় থেকেই সুইডেনের সামাজিক কাঠমোয় এক পরিবর্তনহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতাবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে মাত্রাতিরিক্ত আর্থিক সচ্ছলতা, বিত্তের অভাবনীয় প্রাচুর্যে সংশয়হীন অবাধ যৌনবিলাস মানুষের মজ্জাগত হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটের ভেতর দিয়েই পরিক্রমা করতে গিয়ে বার্গম্যান মানুষের বাসনা-কামনাকে শরীরী প্রেমের প্রবল উত্তাপে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ করার বিষয় যে তাঁর 'ট্রিলজি'-তে বার্গম্যান যৌনতাকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেখানে মানুষের অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টি বিজড়িত। ট্রিলজি সম্পর্কে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা ছিল, "My basic concern in making them (Trilogy) was to deamatoze all-importance of communication, of the capacity for feeling ... most of the people of these films are dead, completely dead. They don't know how to love"। প্রেমের জন্য আকাঙ্ক্ষ, জৈব তাড়নার তীব্র আর্তি, সেইসঙ্গে মানবিক উত্তরণের প্রচেষ্টায় পাপবোধ ও স্বকীয় অস্তিত্বের উপলব্ধিতে এই 'ত্রয়ী' বার্গম্যানের সমগ্র শিল্পজীবনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এটা স্বীকার করা ভালো যে, বার্গম্যান ছবিতে পাত্রপাত্রীর যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি ও আচরণ চিত্রিত করতে গিয়ে কখনো নরনারীর সম্পর্ক চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেননি।

তাঁর কাছে মানবমানবীর শারীরিক আকাঙ্ক্ষ মানুষের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরীর সর্বব্যাপী উপাদান। তাঁর ছবিতে যে দার্শনিক মননের প্রতিচ্ছায়া দেখি তা অনেকটা দান্তেধর্মী নরকবর্ণনার সমগোত্রীয়। মানুষের এত একান্ত ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত যৌনজীবনের ছবি অন্য কোনো স্রষ্টার চলচ্চিত্রে চিত্রিত হয়নি। তবু তাঁর ছবির যৌনতা আমাদের মধ্যে কামোদ্দীপনা উস্‌কে দেয় না, পরন্তু এক প্রবল ভয় ও অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে। যৌনতার প্রসঙ্গে তাঁর ছবির শিল্প আঙ্গিক ও তার চিত্রায়ণের পটভূমিতে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারীদেরই প্রাধান্য বেশি। এখানে কেবল নারীর গোটা শরীর নয়, বিশেষ করে নারীর মুখের বিচিত্র গভীর অভিব্যক্তির নানা প্রকৌশলেরই অনবদ্য close up নারী চরিত্রের অন্তর্লীন ব্যথাকে উপড়ে নিয়ে হাজির করে আমাদের সামনে। এক এক নারী এক এক ব্যথা ও দহনের প্রতীকে কখনো বা আসঙ্গলিপ্সার উদগ্র কামনায় চিত্রিত হয়। তাঁর 'সামার ইন্টারলুড'-এর মারি যেমন গম্ভীর, বিষণ্ণতামগ্ন, 'সামার উইথ মণিকা'র মণিকা সেখানে ইন্দ্রিয়ভোগে উন্মুখ, মনের গভীরতাহীন।

একদিকে কামনামদির শরীরী লিপ্সায় অভিলাষী নারী, অন্যদিকে প্রেম, সারল্য আর বিশ্বাসের প্রতিভূ নারীর বৈপরীত্যে তিনি জীবন-যৌবন-যৌনতার প্রকৃত অন্বয় খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁর নারীদের অধঃপতিত যৌনাচার অনেকটাই যেন নিয়তিনির্দিষ্ট, যেমনটি চলে আসছে মানবজাতির উষালগ্ন থেকে। নারীরা অক্ষম, তারা নিজেদের জীবনটাকে আলাদাভাবে গুছিয়ে নিতে পারে না, তাই পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনায় অহরহ পীড়িত হয়। সাধারণভাবে বার্গম্যানের ছবির মেয়েরা শরীরী চেতনাতেই বেশিমাত্রায় উপস্থাপিত, যে চেতনা অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়সুখের রূপকল্পে চিহ্নিত। শরীরী আকাঙ্ক্ষ যেখানে অগ্রাহ্য হয়, সেখানে প্রত্যাখ্যানের ফলস্বরূপ হতাশা জন্ম নেয়। যেখানে সে বাসনা কোনোভাবে চরিতার্থতা পায়, সেখানে নারীর মন ও মধ্যবিত্তসুলভ শোভনতা অবনমিত হয়, জন্ম নেয় এক অস্বস্তি ও তদ্রুপ আত্মঘৃণা। আর তাই every feeling of emotion in these women is burdened with weight of animal lust and a parallel contempt for that craving with the individual herself.

'সাইলেন্স'এর দুই নারীর মতো তাঁর 'পার্সোনা' ছবিতে দুটি নারীর সমকামিতার প্রসঙ্গ আছে, সেইসঙ্গে নার্স এ্যালমার জনৈক তরুণের সঙ্গে সমুদ্রে বালুকাবেলায় যৌনসঙ্গমের ভাবাবেশময় বর্ণনা দেওয়া সংলাপ। পার্সোনা ছবি থেকে আমরা আর এক বার্গম্যানের মুখোমুখি হই যেখানে তাঁর শিল্প অন্বেষা আর মানবিক সম্পর্কের অনুসন্ধান অন্য মাত্রা অর্জন করে। এলিজাবেথ ও এ্যালমার পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভাব বিনিময়ে বার্গম্যান শরীরী আবেগ ও লজ্জাবোধ থেকে উদ্ভূত আত্মোপলব্ধির

ইঙ্গিত দেন।

বার্গম্যানের বিষয়বস্তু বিন্যাসে তথা চরিত্রদের যৌনাচারের অভিব্যক্তিকে কোনো কোনো পশ্চিমী সমালোচক গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। রিচার্ড রাউডের মতো বিখ্যাত সমালোচক 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন — "I find [Berman's film] adolescent, pretentious, silly and visually undistinguished."। কেবল বিদেশেই নয়, এ দেশের কোনো কোনো সমালোচকও চলচ্চিত্রের মাধ্যমগত অজ্ঞতাজনিত মানসিকতায় এবং আধুনিক সিনেমায় প্রতিফলিত ব্যক্তিমানুষের শারীরিক ও আত্মিক যন্ত্রণার তীব্রতাকে সঠিকমাত্রায় অনুধাবন করতে না পেরে, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন। আসলে বার্গম্যান তাঁর ছবির নরনারী বিশেষত নারীদের শরীর ও মনের গহন অন্ধকারকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর ছবির পাত্র পাত্রীর জীবনাকাঙ্ক্ষ, তাদের প্রেম ও তীব্র শরীরী বাসনা একালের অবক্ষয়জনিত চেতনার রসে জারিত হয়েছে। আধুনিক কাল ও তার ক্লেদাক্ত রূপ সম্যক অনুধাবন করতে না পারলে তাঁর ছবির চিত্রিত ছায়ায় প্রেম ও যৌনতার অকপট চেহারায় ভ্রান্তি জন্মাতে পারে। বার্গম্যান সে ব্যাপারে দর্শককে বারবার সচেতন করে দিয়েছেন। বার্গম্যান একবার উচ্চারণ করেছিলেন—

"আমরা নিশ্চিতভাবে এক প্রদোষান্ধকার জগতে বাস করছি
কিন্তু আমি জানি না, এ আঁধার কবে অপনোদিত হবে।"

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বার্গম্যান সেই আলোর জগতের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, যেখানে বিশ্বের আধুনিক মানব মানবী পরিশুদ্ধ চেতনায় মানবিক উত্তরণের সেতু পার হবে।

বার্গম্যানের ছবিতে মেয়েদেরই আধিপত্য চোখে পড়ে বেশি। যদিও ম্যাক্স সিডো, ভিক্টর সোস্ত্রোম কিংবা গুণার বনস্ট্র্যান্ড-এর মতো অতি প্রতিভাবান পুরুষ শিল্পীরা তাঁর বহু ছবির পুরুষ চরিত্রকে রক্তমাংসে জীবন্ত করে তুলেছেন। তবু যেন নারীরাই তাঁর ছবির কেন্দ্রে বিরাজিতা। সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে নারীবাদী পরিচালক বললে অসঙ্গত হবে না। লক্ষণীয় যে, বার্গম্যান একদিকে যেমন রমণীর মগ্ন পূজারী, আবার তিনিই অদ্ভুত নির্মমতায় তাঁর নারীদের নিগ্রহ করেছেন। আসলে তাঁর ছবিতে নারী চরিত্রের আবেগ অনুভূতি ও রহস্যের উন্মোচনেই বার্গম্যান বেশি মনোনিবেশ করেছেন সেখানে পুরুষদের ভূমিকা অনেকটা নিরপেক্ষ দর্শকের মতো। বার্গম্যানের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উল্লেখযোগ্য — "পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণীত

হোক আমি চাই না। নারী সম্পর্কে আমার কোনো স্থিরীকৃত মীমাংসিত দর্শন নেই। ... মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালো লাগে, আনন্দ হয়, সেটা অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র যেহেতু আমি পুরুষ মানুষ।"

চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বার্গম্যানের ধ্যান ধারণা থেকে আমরা তাঁর শিল্প দর্শনের অনেকটা ইঙ্গিত পেয়ে যাই। চলচ্চিত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্ববন্দিত হলেও, আমরা বিস্মৃত হই না যে, তাঁর প্রথম প্রেম নাটক। শিল্পীজীবনের শুরু থেকে অন্তিম পর্যন্ত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়েছিলেন মঞ্চের সঙ্গে। বছরের অর্ধেক সময় কাটিয়েছেন নাট্য প্রযোজনায়, বাকিটা সময় ব্যয়িত হয়েছে চলচ্চিত্র নির্মাণে। বিশ্বের অন্য কোনো স্রষ্টার কথা আমাদের জানা নেই যিনি সমান দক্ষতায় মঞ্চমায়ায় মানুষকে মুগ্ধ করেছেন। একইসঙ্গে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন সার্ত্র ও কামুর দর্শনে। ধ্রুপদী রচয়িতাদের মধ্যে স্ট্রীন্ডবার্গের রচনায় তিনি একইসঙ্গে উৎসাহিত, আবার কখনো বিরক্ত বোধ করেছেন। তাঁর কোনো ছবির নেপথ্যে ইব্‌সেনের প্রভাবও অলক্ষিত থাকে না। রাজনীতি, সমাজ সমস্যা তাঁকে তেমনভাবে টানেনি। ধর্মীয় প্রশ্নটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সমাজ বাস্তবতার শিকড়ে নিহিত যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মুক্তি কিংবা অভিশাপ — সবকিছুই তাঁর কাছে ধর্মীয় অনুষঙ্গে বিবেচ্য হয়েছে। মানুষের মনোবিকলন তথা গোটা অন্তর্লোকের আবৃত জগৎটাকে তিনি তন্নতন্ন করে তল্লাসি করেছেন। সেখানে স্বপ্ন-স্মৃতি-আকাঙ্ক্ষমদির ছবিগুলো আমাদের কাছে অনেকটাই অধরা থাকে। বার্গম্যান সেই ছবিগুলোকে আলোকোজ্জ্বল দ্যুতিতে সিনেমার পর্দায় তুলে ধরেন। সিনেমাকে ভালোবাসার পেছনে বার্গম্যানের সেই প্রলোভনও ছিল — "No other art medium—neither painting nor poetry can communicate the specific quality of the dream as well as the film can."। নিজের ছবি করার প্রসঙ্গে তিনি স্পর্ধিত উক্তি করেন — "আমি সৃষ্টি করি সমসাময়িককালের মানুষের জন্য, অনন্তকালীনতার কথা আমার সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি ভাবি না। আমার এই অহংকারটাই একজন স্রষ্টার অহংকার।" তাঁর শৈশবের নিরুত্তাপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাঁকে খানিকটা ঈশ্বরবিশ্বাসী করে তুলেছিল। পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের পার্থিব অবস্থানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত ছিলেন, আর এখানেই ঈশ্বর-নিরীশ্বর, ধর্ম-আনুষ্ঠানিক প্রথা ইত্যাকার বিষয়গুলো তাঁকে নিয়ত বিব্রত করেছে। নিজের বাড়ীতে যাজকপিতার নিরুত্তাপ ধর্মপালনের ক্রিয়াকাণ্ড দেখেছিলেন তিনি, দেখেছিলেন পাপস্খলনের হেতু শাস্ত্র অনুমোদিত শাস্তিদানের প্রথা। তাই স্রষ্টাধর্মের বিপরীতমুখী কোনো বিশেষ মানবিক আস্থায় তিনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। "If I have objected strongly to christianity, it has been because christianity is deeply branded by a very virulent humiliation motif."। ধর্মীয় প্রসঙ্গে

বার্গম্যান লক্ষ করেছিলেন যে, ধর্মীয় উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ গভীরভাবে ঈশ্বরীয় প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়েছে কিন্তু অবচেতনায় গোপনে মানুষ প্রথাসিদ্ধ রীতিনীতি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে।

বার্গম্যানের শিল্প প্রকরণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা আশ্চর্যবোধ কাজ করে। জন ফোর্ড এবং জাঁ রেনোয়ার ছবি তাঁর পছন্দ ছিল। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সিনেমার বহু দুর্ধর্ষ টেকনিকসম্পন্ন ছবিও তাঁর দেখা ছিল। কুরোসাওয়ার ছবিও ভালোবেসেছেন তিনি। অথচ সিনেমার চোখ ধাঁধানো কৃৎকৌশলে তিনি অনুপ্রাণিত হননি। মনে রাখা দরকার সুইডিস চলচ্চিত্রে কোথাও আইজেনস্টাইন রীতির সম্পাদনা তথা মন্টাজ কিংবা ক্যামেরা গতির দ্রুততা লক্ষণীয় নয়। বার্গম্যানের ছবিতেও তাই এক ধীর, শান্ত পরিমণ্ডলেই ক্যামেরা ঘোরাফেরা করেছে। তাঁর গোটা শিল্পকর্মের মধ্যে close up -এর অপরূপ সৌন্দর্য বিধৃত আছে। মানুষের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনায় মুখাবয়বই তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য ছিল। তাঁর ছবির অন্যতম অভিনেত্রী লিভ উলম্যান জানিয়েছিলেন — "When the camera is close as Ingmar's sometimes get; it doesn't only show a face but also what kind of life this face has seen." পঞ্চাশ দশকে বার্গম্যান মুখের ক্লোজ আপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ৮৫-১০৫ মিলি মিটারের ফোকাল লেংথের পোর্ট্রেট লেন্স ব্যবহার করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে চরিত্রের আত্মিক স্বরূপ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি বেছে নেন ১৩৫-২০০ মিলি মিটারের টেলিফোটো লেন্স। কখনো বা দীর্ঘ ফোকাল লেংথের জুম লেন্স ব্যবহৃত হয়। সিনেমার আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর কথায়, "আমি এমন একটি পরিশীলিত মাধ্যমকে গ্রহণ করেছি যার সাহায্যে আমি একজন মানুষের মনে আত্মবিস্মৃতি ঘটাতে পারি, পারি যে কোনো বিষয়ে বিশ্বাসের আলোকপাত করতে, কিংবা নির্মমভাবে বাস্তবের স্বরূপটি তাঁর সামনে উন্মোচিত করে তাঁর জ্ঞানের রাজ্যে বাস্তবের সীমাকে বর্ধিত করতে পারি... এই মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব।" ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাঁর ক্যামেরাম্যান ছিলেন গুণার ফিশার। সেভেন্থ সীল, সডাস্ট এ্যান্ড টিনসেল, ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ-এর মতো ছবিতে সাদাকালোর মহিমময় বিন্যাসে ফিশার বার্গম্যানের ছবিকে একটা মাত্রা দিয়েছিলেন। 'ডেভিলস্ আই' ছবি করার সময় থেকেই দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং ব্যবধান বাড়তে থাকে। বার্গম্যানের চলচ্চিত্রকর্মে ক্যামেরাম্যান হিসেবে ওঠে নতুন নাম স্ভেন নিক্ভিস্ট। বার্গম্যানের অনবদ্য কয়েকটি সাদাকালো ছবির পাশাপাশি অসাধারণ রঙীন ছবি ক্রাইজ এ্যানড হুইসপার্স, শেম, পার্সোনা ইত্যাদিতে নিক্ভিস্টের ক্যামেরা আমাদের নতুন করে মুগ্ধতায় জড়িয়ে নেয়।

বার্গম্যান মন্তব্য করেছিলেন : "প্রত্যেকটি নির্মাণের ক্ষেত্রেই আমি সমান আনন্দ

পাই। আমি ভগবানে বিশ্বাসী অথবা নাস্তিক, কিংবা খৃষ্টান না প্যাগান এ প্রশ্ন আমার ক্ষেত্রে আসতেই পারে না।... আমার প্রথম ও শেষ নাম আমার সৃষ্টির গায়ে কোথাও খোদাই হয়ে থাকবে না, আমার মৃত্যুর সাথে সাথে নামও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আমার আত্মার একটি ছোট অংশ বেঁচে থাকবে অজ্ঞাত জয়ীর সম্পূর্ণতায়।" বার্গম্যানের ছবি একইসঙ্গে সুন্দর ও নির্মম, দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাতে বিচূর্ণ মানবসত্তার বিপর্যয়কে তিনি আমাদের বোধ ও মননে ব্যাপ্ত করেছেন। মানবের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি নিয়ত অস্থিরচিত্ত ছিলেন। তাঁর ছবিতে গোটা মানবজাতির নিঃসঙ্গকাতর চরম একাকিত্বের হাহাকার ব্যঞ্জনা পেয়েছে অপরূপ শিল্প নন্দনে। আধুনিক বিশ্বের এমন এক মহান রূপকার প্রয়াত বার্গম্যানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রবিশস্য— জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০০৮